স্বামী বিবেকানন্দ : নতুন পৃথিবীর কলম্বাস

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

মানবসভ্যতার ঊষালগ্নের কালনিরূপণ এখনো হয়নি, কখনো হবে বলেও মনে হয় না। পৃথিবী জুড়ে পণ্ডিতগণ অবশ্য তাবলে থেমে নেই। গবেষণার পর গবেষণা চলেছে, অগণিত মত উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং হয়েই চলবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কোন মতই অবিসংবাদিতরূপে গৃহীত হচ্ছে না। গৃহীত হবেই বা কিভাবে, এক্ষেত্রে সবই যে অনুমান-নির্ভর। যাকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা যায়, সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার এখন তো আর কোন উপায় নেই, একজন বা একদল পণ্ডিত হয়তো কোন সূত্র থেকে একটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, তৎক্ষণাৎ অথবা কিছুকাল পরে অপর একজন বা একদল পণ্ডিত অপর একটি সূত্র আবিষ্কার করে পূর্ববর্তী পণ্ডিত বা পণ্ডিতবর্গের দাবিকে নস্যাৎ করে দিলেন। সুতরাং স্থির সিদ্ধান্ত আমরা আর পাচ্ছি না এবং যা আগেই বলেছি, পাওয়ার আশাও নেই। কারণ, কে না জানে-''নানা মুনির নানা মত'' নানা মতের ঐক্যমত্য হওয়া যে কঠিন এবং এরকম সুগভীর একটা বিষয়ে যে তা অসম্ভব, তা মহাভারতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। বকরূপী ধর্মকে যুধিষ্ঠির সেই কবেই বলেছিলেন : ''নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্''[১]—তিনি মুনিই নন, যাঁর মত অন্য মুনির মত থেকে ভিন্ন নয়।

মানবসভ্যতার ঊষালগ্নের কালনিরূপণ না হলেও একটা বিষয় কিন্তু অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার্য যে, মানবসভ্যতার সূচনা হয়েছে সেই ক্ষণে, যখন আদি মানব-মানবী আপন শক্তিকে উপলব্ধি করেছে এবং সেই শক্তিকে প্রকাশ বা বিকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছে। অতএব বলা যেতে পারে যে, মানুষের আত্মশক্তির উপলব্ধি ও তার বিকাশের প্রেরণা ও প্রয়াস থেকেই মানবসভ্যতার উন্মেষ। আমরা মনে করি, তা যেমন সভ্যতার সূচনা, তেমনি সূচনা ধর্মেরও যা কিনা সভ্যতার প্রকৃত ধারক ও নিয়ামক। যমজ সন্তানের মধ্যেও অগ্রজ থাকে সভ্যতা ও ধর্মের মধ্যে কে অগ্রজ তা নিয়ে বিচার চলতে পারে, তবে আমরা উভয়কে একই মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠদেশ বলে মনে করি। ধর্ম এবং সভ্যতার অজস্র সংজ্ঞা রয়েছে এবং তা নিয়েও বাক্বিতণ্ডার শেষ নেই। তবে আমাদের বিশ্বাস, এবিষয়ে শেষকথাটি বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

তিনি বলেছেন : যে যত পরিমাণে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী সে তত পরিমাণে ধর্মের নিকটবর্তী, যে যত পরিমাণে ধর্মের সমীপবর্তী সে তত পরিমাণে সভ্য। অর্থাৎ সভ্যতা ও ধর্মের মূলকথা হলো আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং সেই শক্তির জাগরণ ও বিকাশসাধন। জগতের সকল সভ্যজাতির ইতিহাস এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবন আলোচনা করলে এটাই প্রতিপন্ন হয়। সে-ইতিহাস মায়া, মিশর, পারস্য, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতারই হোক অথবা গ্রীক, রোমান, ভারতীয় বা চৈনিক সভ্যতারই হোক যদি ব্যক্তি হিসাবে জরথুস্ট্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মোজেস, মহম্মদ, লাওৎসে, কনফুসিয়াসের জীবন পর্যালোচনা করি, তাহলেও আমাদের সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে। আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে আব্রাহাম লিঙ্কন পর্যন্ত সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে পৃথিবীর বুকে একটা নতুন সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করেছিল, যা বিগত দুই শতক ধরে পৃথিবীর চিন্তা ও আদর্শকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। সেই নতুন সভ্যতার নাম মার্কিন বা আমেরিকান সভ্যতা। আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে একজন অপরিসীম আত্মবিশ্বাসী মানুষ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। সেই মানুষটির নাম কলম্বাস। বহু বাধা-বিঘ্ন, প্রতিপদে জীবনহানির আশঙ্কা-কোনকিছুই স্পেনদেশীয় ঐ অসমসাহসী মানুষটিকে টলাতে পারেনি, তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সুদৃঢ় সঙ্কল্পের কাছে প্রতিবন্ধকের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। নতুন মহাদেশ আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং ফলে কলম্বাস হয়ে উঠেছিলেন ইতিহাসের নায়ক।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে 'ওয়ার্ল্ডস কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন' অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল-মানুষ তার সভ্যতার সাম্প্রতিকতম অগ্রগতি পর্যন্ত স্থূলজগতে যত প্রকার উন্নতিসাধন করেছে, তার সকল নিদর্শনকে সমবেত করা। সেই অনুসারে সেখানে পাশ্চাত্য কৃষ্টির নিদর্শনগুলি তো অবশ্যই স্থান পেয়েছিল, অনুন্নত দেশগুলির-যাদের বর্তমান পরিভাষায় 'তৃতীয় বিশ্ব' বলে অভিহিত করা হয়-সংস্কৃতির সাক্ষাৎ নিদর্শনও সেখানে প্রতীকাকারে সংগৃহীত হয়েছিল। অতঃপর সংগঠকগণের মনে হলো, মনোজগতে মানবের উন্নতির নিদর্শনেরও সেখানে স্থান না থাকলে মানবসভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসকে উপস্থাপন করা হবে না। সেই উদ্দেশ্যে কুড়িটি 'কংগ্রেস' বা মহাসম্মেলন বা মহাসভার আয়োজন করা হয়। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মে থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত এইসমস্ত 'কংগ্রেস'-এর অধিবেশন চলে। সামাজিক উন্নতি, আইন ও সমাজসংস্কার, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি ছিল 'কংগ্রেস'গুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রচার, জনপ্রিয়তা এবং বর্ণাঢ্যতায় ধর্ম-কংগ্রেস বা ধর্মমহাসভা শিকাগো তথা আমেরিকার জনসাধারণের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ধর্মমহাসভার সূচনা হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর এবং সমাপ্তি হয়েছিল ২৭ সেপ্টেম্বর।

সাধারণ বিচারে শিকাগোর ধর্মমহাসভা অবশ্যই একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা তো অনেকেই আছে, কিন্তু সব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা স্বয়ং ইতিহাস হয়ে ওঠে না-উঠতে পারে না। শিকাগোর ধর্মমহাসভা সেই বিরল ঘটনাগুলির অন্যতম, যেখানে একজন তিরিশ বছরের নিঃসম্বল সন্ন্যাসী পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে স্বয়ং ইতিহাস হয়ে উঠেছিলেন। শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রশস্ত 'হল অফ কলম্বাস'-এ যে কয়েক হাজার মানুষ প্রবল উত্তেজনায় ঐ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁরা তখনো জানতেন না যে, পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন এক ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রলগ্ন সমাগত। সমাগত নতুন ইতিহাসের

জন্মমুহূর্ত, সমাগত নতুন সভ্যতার আত্মপ্রকাশের পরম মুহূর্ত, সমাগত নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের প্রার্থিত প্রহর। 'নতুন ইতিহাসের স্রষ্টা' সেই 'নব-কলম্বাস'-এর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। মানবশক্তির কোন্ চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভব, মানব-ভাষণ কোন্ উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করতে পারে, সেই অধিবেশনের শ্রোতৃবৃন্দ তার সাক্ষী হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসেরও একটা ইতিহাস থাকে, সূচনারও থাকে সূচনা। আমরা এখন সেই পূর্ব-ইতিহাসের দিকেই দৃষ্টি দেব।

ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোয় এসে পৌঁছান ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জুলাই। জনাকীর্ণ শিকাগো রেলস্টেশন থেকে তিনি নেমে আসেন শিকাগোর রাস্তায়। কলম্বিয়ান এক্সপোজিসন বা বিশ্বমেলা উপলক্ষ্যে তখন শিকাগোয় অগণিত মানুষের ভিড়। স্বামীজী দেখলেন, অসংখ্য নরনারী শহরের রাস্তায় হেঁটে চলেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন মুখই তাঁর পরিচিত নয়। অজানা, অচেনা বিশাল শিকাগো শহরে কোথায় যাবেন, কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না তিনি। আশ্রয়, আহার, বিশ্রাম সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ওদেশের অনভ্যস্ত শীতে তিনি জর্জরিত, দীর্ঘ পথশ্রমে অতিমাত্রায় ক্লান্ত। কিন্তু কে তাঁকে এই নির্বান্ধব অপরিচিত ভিনদেশী বিরাট শহরে আশ্রয় দেবে? অবশেষে শহরের একটি হোটেলে উঠলেন তিনি।

কোথায় ভারতের পথে পথে, অরণ্যে-পর্বতে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ধ্যান, তপস্যা, স্বাধ্যায়, মাধুকরী ও স্বেচ্ছাবিচরণের জীবন; আর কোথায় পোশাকী সভ্যতার পাদপীঠ আমেরিকার এক ব্যস্ততম বিশাল আধুনিক বাণিজ্যনগরী শিকাগোর কোলাহল, আড়ম্বর ও ভোগবাদের ফেনায়িত পরিমণ্ডল! দৃশ্য ও পরিবেশ, জীবনযাত্রা ও জীবনদর্শনের এই অভাবনীয় বৈপরীত্যে তাঁর বৈরাগ্যপ্রবণ মন প্রচণ্ডভাবে বিচলিত হলো। অতঃপর তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল এক বিরাট আশাভঙ্গের আঘাত। অবিলম্বেই তিনি জানলেন যে, ধর্মমহাসভা শুরু হওয়ার অনেক আগেই তিনি শিকাগোয় এসে পৌঁছে গিয়েছেন। ধর্মমহাসভা শুরু হবে ১১ সেপ্টেম্বর-তখনো ছয় সপ্তাহ দেরি। আমেরিকা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তাঁর ভারতীয় বন্ধুরা তাঁর যে-পোশাক করিয়ে দিয়েছিলেন তা ছিল এখানকার প্রচণ্ড ঠাণ্ডার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং তাঁরা যে অর্থ তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন, শিকাগোর অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ হোটেলে তাতে অতদিন থাকাও অসম্ভব।

শুধু তাই নয়, তিনি জানতে পারলেন, ধর্মমহাসভায় তাঁর যোগদান করা কখনোই সম্ভব হবে না। কারণ, ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হতে হবে এবং আমন্ত্রিত প্রতিনিধিকে সঙ্গে বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যোগ্যতাসূচক পরিচয়পত্র। স্বামীজীর কাছে কোনটিই ছিল না। তিনি আমন্ত্রণও পাননি এবং তাঁর কোন পরিচয়পত্রও ছিল না। তিনি আরো জানতে পারলেন যে, প্রতিনিধি হিসাবে নাম নথিভুক্ত করার সময়সীমাও উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তীরে এসে কি তাহলে তরী ডুবে যাবে? গভীর হতাশা ও বিষাদে ভরে গেল স্বামীজীর মন। আমেরিকা তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে ভারতবর্ষের ধর্ম ও ঐতিহ্যের গৌরবগাথা, ভারতের ওপর ব্রিটিশের নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের কথা তাহলে তিনি তুলে ধরতে পারবেন না ভারতের দরিদ্র ও উপেক্ষিত গণমানুষ এবং নারীসমাজের উন্নতির জন্য তাঁর অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা তাহলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে একসময় মনে হলো, ভারতে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন : "এখানে আসার আগে যেসব সোনার স্বপ্ন দেখতাম, তা ভেঙেছে। এখন অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। শত শত বার মনে হয়েছে, এদেশ থেকে চলে যাই কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের কাছে আদেশ পেয়েছি। আমি কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তাঁর চোখ তো সব দেখছে। মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়ছি না।"[২]

গভীর অন্ধকারের মধ্যে নিষ্কম্প অগ্নিশিখার মতো তাঁকে পথ দেখাল তাঁর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও উপলব্ধি। তিনি নিশ্চিত জানতেন, এই পরিক্রমা একটি দিব্য পরিক্রমা-ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশে তা সম্পাদিত হচ্ছে। বাস্তবিকই, ঈশ্বরের চোখ যে তাঁকে সতত এই পরিক্রমায় অনুসরণ করছিল তা অচিরেই প্রমাণিত হবে।

শিকাগোতে লোকমুখে তিনি শুনলেন যে, বস্টনে অনেক কম খরচে থাকা যায়। সেই অনুসারে সম্ভবত ১২ আগস্ট বস্টনে চলে যান তিনি। যাওয়ার আগে শিকাগোর বিশ্বমেলাটি তিনি ভাল করে ঘুরে দেখে নিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলীতে বোঝা যাবে, বস্টনে তাঁর আগমনের মাধ্যমে ঈশ্বর যেন শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রবেশের স্বর্ণকুঞ্চিকা(Golden key) তাঁর হাতে অর্পণ করেছিলেন।

ভ্যাঙ্কুভার থেকে শিকাগো আসার সময় ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিকের অবজারভেশন কামরায় মিস ক্যাথরিন স্যানবর্ন নামে এক বিদুষী ও সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়া মহিলার সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়।[৩] শিকাগোয় ট্রেন থেকে নামার আগে বস্টনের কাছে মেটকাফ-এ তাঁর খামারবাড়ি ব্রীজি মেডোজ-এর ঠিকানা দিয়ে মিস স্যানবর্ন স্বামীজীকে সেখানে আতিথ্যগ্রহণের সাদর আমন্ত্রণ জানান। বস্টনে এসে স্বামীজী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ব্রীজি মেডোজে আতিথ্যগ্রহণ করেন। ব্রীজি মেডোজে স্বামীজীর আগমন ১৮ আগস্টের আগেই হয়েছিল।

ব্রীজি মেডোজে তাঁর আগমনের সূত্র ধরে বস্টন ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে তাঁর পরিক্রমা শুরু হলো। মিস স্যানবর্নের সূত্রেই স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় হয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের সঙ্গে, যিনি ধর্মমহাসভায় যোগদানের ব্যাপারে স্বামীজীকে আশ্বস্ত করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্বামীজীর পরিচয়পত্র লিখে দেন, যে-পরিচয়পত্রের সুবাদে ধর্মমহাসভায় তাঁর প্রবেশাধিকার ঘটবে। পরিচয়পত্রে তিনি লিখেছিলেন : স্বামীজী ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য সর্বগুণসম্পন্ন প্রতিনিধি। তাঁর পাণ্ডিত্য আমেরিকার সমস্ত বিদগ্ধ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যের সমষ্টির চেয়েও বেশি।[৪]

আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ পর্যন্ত স্বামীজী বস্টন অঞ্চলে ছিলেন। এই তিন সপ্তাহ স্বামীজী বস্টন, অ্যানিস্কোয়াম, সালেম, সারাটোগা স্প্রিংস প্রভৃতি স্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আয়োজিত প্রকাশ্য ও ঘরোয়া সভায় এবং চার্চে অন্ততপক্ষে এগারোটি বক্তৃতা ও আলোচনা করেছিলেন। তুলে ধরেছিলেন ভারতের ধর্ম, ঐতিহ্য, সমাজ ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে সত্য ইতিহাসকে, তুলে ধরেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির মহান বৈশিষ্ট্যকে, তুলে ধরেছিলেন ভারতের ওপরে ব্রিটিশ শাসনের নির্মম অত্যাচারের ইতিবৃত্তকে।

এরপর ৮ সেপ্টেম্বর যখন বস্টন থেকে ট্রেন ধরে ৯ সেপ্টেম্বর তিনি শিকাগোয় পৌঁছালেন, তখন ধর্মমহাসভায় আবির্ভূত হওয়ার জন্য তাঁর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে অপরিকল্পিত এবং আকস্মিক ছিল শিকাগো থেকে তাঁর বস্টনে আগমন, কিন্তু এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে ধর্মমহাসভায় তাঁর গৌরবময় আবির্ভাবের দৈবনির্ধারিত শেষ মুহূর্তের মহড়া।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সকাল দশটায় শিকাগোর বিখ্যাত 'আর্ট ইনস্টিটিউট'-এর কলম্বাস হল-এ শুরু হয়েছিল সেই বিশ্বখ্যাত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন অধিবেশন। আমেরিকার পত্রিকাগুলির প্রতিবেদন এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, আমেরিকার মানুষ বিরাট প্রত্যাশা ও আগ্রহ নিয়ে ধর্মমহাসভার উদ্বোধনের জন্য অপেক্ষা করছিল। নয়টার অনেক আগেই সহস্র সহস্র নরনারীর [কারো মতে ছয় থেকে সাত হাজার, কারো মতে চার থেকে পাঁচ হাজার] সমাগমে প্রেক্ষাগৃহটি উপচে পড়েছিল। সকাল দশটায় হল-এর মধ্যবর্তী পথে বহুদেশের পতাকার নিচে হাতে হাত দিয়ে দুই সারিতে শোভাযাত্রা করে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন ধর্মমহাসভায় সমাগত পৃথিবীর প্রধান দশটি ধর্মমতের প্রতিনিধিরা। বিরাট দর্শকমণ্ডলীর সোৎসাহ সমুচ্চ হর্ষধ্বনি তখন উচ্ছ্বাসে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। প্রতিনিধিদের সম্মুখে ছিলেন ধর্মমহাসভা কমিটির সভাপতি ডঃ জে. এইচ. ব্যারোজ। মঞ্চটি ছিল অপূর্ব চিত্রবৎ-সুন্দর, মনোহারী। যতক্ষণ না সকল প্রতিনিধি আসন গ্রহণ করলেন, ততক্ষণ সম্বর্ধনা-ধ্বনি থামেনি।

মঞ্চের একেবারে মধ্যস্থলে রাজকীয় আসনে উপবিষ্ট উজ্জ্বল রক্তবর্ণ পোশাক-পরিহিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মাচার্য-কার্ডিন্যাল গিবন্স। তাঁর দুই পাশে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিবৃন্দ। কিন্তু সকলকে ছাড়িয়ে, সকলকে ছাপিয়ে উঠেছিলেন উজ্জ্বল গৈরিক পোশাক-পরিহিত ত্রিশোত্তীর্ণ ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। সমবেত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বয়সে সর্বাপেক্ষা নবীন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

সকলে আসন গ্রহণ করার পর বিরাট ঘণ্টায় ধীরে, নির্দিষ্টভাবে দশবার আঘাত করা হলো-প্রত্যেক ধর্মের সম্মানে একটি ধ্বনি। প্রতিটি ধ্বনিই এত গম্ভীর ও দীর্ঘায়িত যে, মনে হলো, প্রেক্ষাগৃহে একেবারে স্তব্ধভাবে উপবিষ্ট কয়েক সহস্র মানুষের আত্মায় তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঘণ্টাধ্বনির তরঙ্গ যখন মিলিয়ে গেল, বিশাল সমাবেশ তখন উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে আন্দোলিত সুরে সুমহান বন্দনাগীতি গেয়ে উঠল। অতঃপর সর্বজনীন প্রার্থনা। প্রার্থনা-শেষে ধর্মমহাসভার পক্ষ থেকে ডঃ ব্যারোজের অভ্যর্থনা-ভাষণ। তারপর কয়েকজন প্রতিনিধির সংক্ষিপ্ত ভাষণ।

এইভাবেই শেষ হচ্ছিল ধর্মমহাসভার উদ্বোধন অধিবেশন। শেষ হওয়ার মুখে শুরু হলো এক মহাঘটনা। নতুন ইতিহাসের নির্মাতারূপে আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মাদকতাময় অপূর্ব কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করলেন তিনিঃ

"হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ..., পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।...

"সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং তার ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মান্ধতা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করে রেখেছে। এরা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করেছে, বারংবার মনুষ্য-রক্তে সিক্ত করেছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং দেশ ও জাতিসমূহকে নৈরাশ্যে নিমজ্জিত করেছে। এইসব ভয়ানক পিশাচেরা যদি না থাকত, মানবসমাজ আজ বহুগুণে সমৃদ্ধ হতো। তবে এদের অন্তিমলগ্ন উপস্থিত। আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্মমহাসভার সম্মানে আজ প্রভাতে যে-ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হয়েছে তা সর্ববিধ ধর্মান্ধতা, অসি ও মসির সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যে অগ্রসর ব্যক্তিদের পারস্পরিক সর্ববিধ অনুদারতার মৃত্যুঘণ্টাস্বরূপ হোক।"[৫]

মানবভাষায় উচ্চারিত পৃথিবীর সর্বকালের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ভাষণগুলির অন্যতম এই ক্ষুদ্র ভাষণটি। স্বামীজী বললেন, পৃথিবীর কনিষ্ঠতম সভ্যতার উদ্দেশে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার এ হলো ভ্রাতৃত্বের বার্তা-বিনিময়।

কী হয়েছিল সেই ভাষণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া? ধর্মমহাসভা সমিতির সভাপতি ডঃ ব্যারোজ লিখেছেন : "মিঃ বিবেকানন্দ যখন শ্রোতৃবৃন্দকে 'হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলে সম্বোধন করলেন, তখন এক তুমুল করতালিধ্বনি উত্থিত হলো, যা কয়েক মিনিটব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল।"[৬] এস. কে. ব্লজেট নামে এক বর্ষীয়সী প্রত্যক্ষদর্শী ভদ্রমহিলা লিখেছেন : "সেই যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে যখন বললেন, 'আমার আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ', তখনই সাত হাজার নরনারী এমন কিছুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল যা তারা ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ ছিল না। যখন তাঁর বক্তৃতা শেষ হলো তখন দেখলাম দলে দলে মেয়েরা তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আসন ডিঙিয়ে ছুটে চলেছে। তখন আমি মনে মনে বললাম, 'দেখ বাছা, এই আক্রমণে যদি মাথা ঠিক রাখতে পার তো তুমি ভগবান'।"[৭]

বিবেকানন্দ ভগবান কিনা অ্যানি বেসান্ত তা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না, কিন্তু বিবেকানন্দ যে দিব্য দীপ্ত প্রভায় সেদিন বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তা তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর সেই অনবদ্য অভিজ্ঞতার কিছু অংশঃ

"শিকাগোর ঘন আবহাওয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য, সিংহতুল্য গ্রীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত ওষ্ঠ, চকিত দ্রুতগতি, কমলা ও হলুদ রঙের পোশাকে পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব-স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়ার রূপ।... সন্ন্যাসী-তাঁর পরিচয়? নিশ্চয়ই। কিন্তু যোদ্ধা সন্ন্যাসী তিনি, প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চেয়ে যোদ্ধাই বেশি মনে হয়-মঞ্চ থেকে নেমে এসেছেন, দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায়-পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি, পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন কৌতূহলী অর্বাচীনদের দ্বারা, যারা কোনমতেই নিজেদের দাবি ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, তারা যেন বলতে চায়, তিনি যে সুপ্রাচীন ধর্মের প্রতীকপুরুষ, সেই ধর্ম আশপাশে সমবেত ধর্মসমূহের মহিমার চেয়ে হীনতর। কিন্তু না, তা হওয়ার নয়। ধাবমান ও উদ্ধত পাশ্চাত্য দেশের কাছে ভারত, যতক্ষণ তার এই বাণীবহ সন্তান বর্তমান আছে ততক্ষণ লজ্জিত থাকবে না। ভারতের বাণীকে তিনি বহন করে এসেছেন-ভারতের নামে তিনি দাঁড়িয়েছেন। সকল দেশের রানীর মতো যে-দেশ

থেকে তিনি এসেছেন–তার মর্যাদার কথা স্মরণ রেখেছিলেন এই চারণ সন্ন্যাসী। প্রাণবন্ত, শক্তিধর, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্থির স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষের মধ্যে পুরুষ–নিজেকে উত্তোলন করার মতো সামর্থ্যসম্পন্ন পুরুষ।

"মঞ্চের ওপর অপর পক্ষও আত্মপ্রকাশ করেছিল মর্যাদা, যোগ্যতা ও শক্তির দ্যোতনা সেখানেও ছিল কিন্তু সবকিছুই আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিবেকানন্দের দ্বারা আনীত অধ্যাত্ম বাণীর অপরূপ সৌন্দর্যের কাছে... জ্বলে উঠল প্রাচ্যের দিব্যবাণীর অতুলনীয় মহিমা। মোহিত ও অভিভূত সেই বিরাট জনমণ্ডলী উৎকর্ণ হয়ে রইল তাঁর প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের জন্য, অপেক্ষা করে রইল রুদ্ধশ্বাসে–যে–ধ্বনিতরঙ্গ ঐ আছড়ে পড়ছে, ওর কিছুই যেন হারিয়ে না যায় 'ঐ লোকটিকে আমরা পৌত্তলিক বলেছি'–বিশাল সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একজন বলে উঠলেন–'আর ওঁর দেশে মিশনারি পাঠাচ্ছি এদেশে ওঁদেরই মিশনারি পাঠানো উচিত।' "[৮]

অ্যানি বেসান্ত অনেক কথা বলেছেন। তার মধ্যে শুধু দুটো প্রধান বক্তব্য আমরা তুলে দিচ্ছি। এক–পাশ্চাত্যের পরস্বাপহারী সভ্যতার আস্ফালনকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে স্বামীজী উত্তোলন করেছিলেন সভ্যতার জননীসদৃশ ভারতবর্ষের মহিমার বিজয়পতাকা, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব। দুই–ধর্মমহাসভাকে কেন্দ্র করে আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের খ্রীস্টীয় প্রাধান্য–প্রমাণের পরোক্ষ কূটনীতি। বিবেকানন্দ সেই হীন চক্রান্তকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। ভারত তথা প্রাচ্যভূমিকে অপদস্থ করার প্রয়াসকে উলটে তাদের দিকেই স্বামীজী ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমেরিকার সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান এবং শিকাগোর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'শিকাগো ট্রিবিউন'–এর ২০ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, ধর্মমহাসভার নবম দিনে সুস্পষ্ট ভাষায় স্বামীজী বলেছিলেন : "আমরা যারা প্রাচ্য দেশ থেকে আগত, দিনের পর দিন মঞ্চে বসে এই মুরুব্বিয়ানার বচন আমাদের শুনতে হয়েছে–আমাদের উচিত খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করা, কারণ খ্রীস্টান দেশগুলি সর্বাধিক সমৃদ্ধশালী। আমরা চারিদিকে তাকিয়ে কি দেখি? দেখি যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পন্ন খ্রীস্টান দেশ ইংল্যান্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে ২৫০,০০০,০০০ এশিয়াবাসীর গলার ওপর পা দিয়ে। আমরা ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরে তাকাই, দেখি যে খ্রীস্টান ইউরোপের সমৃদ্ধির সূচনা স্পেন থেকে। সেই স্পেনের সমৃদ্ধির শুরু মেক্সিকো অভিযান থেকে। খ্রীস্টান জাতির সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে তাদেরই মতো মানুষের গলা কেটে।"[৯]

শুধু পাশ্চাত্যের ধর্মীয় প্রাধান্য নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্যও প্রমাণ করা ধর্মমহাসভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যের মর্মমূলে আঘাত হেনেছিলেন স্বামীজী। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ধর্মযাজক এইচ. আর. হউইস ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লেখা 'ট্রাভেল অ্যান্ড টক' বইতে তিনি লিখেছেন ['লন্ডন ওম্যান্স হেরাল্ড'–এ ২৬ অক্টোবর ১৮৯৩ এবং 'ইন্ডিয়ান মিরার'–এ ২৮ নভেম্বর ১৮৯৩ তারিখে প্রকাশিত]: "জনপ্রিয় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, যাঁর মুখাবয়বের সঙ্গে বুদ্ধের ক্লাসিক মুখের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রয়েছে, আমাদের [খ্রীস্টানদের] বৈষয়িক সমৃদ্ধি, রক্তাক্ত যুদ্ধ এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে ধিক্কার দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন–'মৃদুস্বভাব হিন্দুরা' কখনো এই মূল্যে আমাদের দর্পিত সভ্যতাকে লাভ করতে চাইবে না।... উচ্চৈঃস্বরে তিনি বলেছিলেন, 'এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে বিজেতার তরবারি নিয়ে তোমরা আমাদের দেশে গিয়েছ। তোমরা–আমাদের তুলনায় তোমাদের ধর্ম গতকালকার, হাজার হাজার বছর আগে আমাদের ঋষিদের কাছ থেকে আমরা তোমাদের খ্রীস্টের শিক্ষা ও জীবনের মতোই মহান পবিত্র শিক্ষা ও জীবন পেয়েছি–সেই আমাদের পায়ের তলায় দলেছ এবং ধূলির মতো তুচ্ছ জ্ঞান করেছ।... তোমরা মাংসাশী জানোয়ার। তোমরা মদ খাইয়ে আমাদের অধঃপাতিত করেছ, অসম্মানিত করেছ আমাদের নারীদের, বিদ্রূপ করেছ আমাদের ধর্মকে–যে–ধর্ম বহুদিক দিয়ে তোমাদের চেয়েও উচ্চাঙ্গের এবং অধিকতর মানবিক।... তোমরা খ্রীস্টের অনুগামী নও, যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি'।"[১০]

ধর্মমহাসভার বিজ্ঞান শাখার সভাপতি মারউইন–মেরি স্নেল লিখেছেন ['ইন্ডিয়ান মিরার'–এ ৯ মার্চ ১৮৯৪ তারিখে প্রকাশিত]: শিকাগোয় অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনকে "নানা কারণে ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ–চিহ্নিত ঘটনা বলা চলে। এর অন্যতম প্রধান অবদান হলো যে, খ্রীস্টান–জগৎ বিশেষত আমেরিকার মানুষ এই মহৎ শিক্ষা পেয়েছে–পৃথিবীতে এমন সব ধর্মও আছে, যেগুলি খ্রীস্টধর্ম অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধেয় দার্শনিক গভীরতায়, আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায়, চিন্তার মুক্ত বীর্যপূর্ণ প্রকাশে, মানবতার প্রতি সহানুভূতির ব্যাপক নিষ্ঠায় সেইসব ধর্ম খ্রীস্টধর্মকে অতিক্রম করেছে, অথচ সেইসঙ্গে নীতির সৌন্দর্য এবং কার্যকারিতাকে একচুলের জন্যও তারা হারায়নি।... কিন্তু এর সাথে এই সত্যটিও স্বীকার করতে হবে যে, হিন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্মই ধর্মমহাসভায় এবং আমেরিকার জনগণের ওপর অনুরূপ বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবে [হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের নাম উল্লেখ করে মিঃ স্নেল লিখেছে] যেকোন বিচারে হিন্দুধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজস্ব (typical) প্রতিনিধি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি ছিলেন প্রশ্নাতীতভাবে ধর্মমহাসভার সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।"[১১]

আমেরিকার 'প্রেস' পত্রিকার সংবাদও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় ['ইন্ডিয়ান মিরার'–এ ৩০ নভেম্বর ১৮৯৩ তারিখে প্রকাশিত]: "এই বৃহৎ সমাবেশের সর্বাপেক্ষা আকর্ষক ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ।... তিনি এমন ভাষণ দিলেন যে, ধর্মমহাসভাকে যেন একেবারে জয় করে নিলেন। সেখানে যেসকল খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের বিশপ ও মিনিস্টাররা উপস্থিত ছিলেন–তাঁদের যেন তিনি উড়িয়ে দিয়ে গেলেন।... এই অসাধারণ আচার্য যেদিন তাঁর প্রথম ভাষণ দিলেন (পরে আরো অনেক ভাষণ দিলেন) তারপর থেকে সর্বত্রই তাঁর পিছনে জনতা ছুটতে লাগল।..."[১২]

'শিকাগো ইন্টার ওসান'–এর সংবাদ [১ সেপ্টেম্বর ১৮৯]: "ধর্মমহাসভায় দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুদের প্রতিনিধি বিবেকানন্দ তাঁর বিজয়ীর মতো আচরণ, তাঁর শক্তিসামর্থ্য এবং স্বধর্মের সকল বিষয়ের ওপর নির্ভীক আলোচনায় যেরকম সৌজন্যপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, সমাগত অন্য কোন প্রতিনিধি তা পারেননি। এই সম্মানিত হিন্দু... হিন্দুধর্ম ও দর্শনের পক্ষসমর্থনে তিনি যে বাগ্মিতা ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু

তাঁর প্রতিই সকলের সম্ভ্রম আকর্ষণ করেনি, উপরন্তু তাঁর শিক্ষাও বিবেচনার যোগ্য, এই মনোভাব সৃষ্টি করেছে।"[১৩]

অবশেষে শেষ হলো শিকাগোর ধর্মমহাসভা। ২৭ সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার সপ্তদশ ও শেষ দিনের সমাপ্তি অধিবেশনে পরমত ও পরধর্ম–সহিষ্ণু খ্রীস্টীয় ও পাশ্চাত্য সমাজকে বিবেকানন্দ শোনালেন তাঁর মহান বার্তাঃ "যদি কেউ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে এবং তাঁর ধর্মই টিকে থাকবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র।... তাঁকে আমি স্পষ্টভাবে বলে দিই, তাঁর মতো লোকেদের বাধাদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লিখিত হবে–'বিবাদ নয়, সহায়তা বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।"[১৪]

এই অনবদ্য বার্তা তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো ঠিকই। কিন্তু এ–বার্তা তাঁর নয়, এ–বার্তা তাঁর মহান আচার্যের। এ–বার্তা ভারতবর্ষের। হ্যাঁ, ভারতবর্ষের–যে–ভারতবর্ষকে তিনি বিশ্বের মানচিত্রে গরীয়ান করে দিলেন, যে–ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য নতুনভাবে আবিষ্কার করল তাঁর মাধ্যমে, যে–ভারত আবিষ্কার করল নিজেকে, যে–ভারত মহান মর্যাদায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখ দিয়ে যেন বলল, আমি মরিনি, আমি জীবিত, চিরজীবিত।

ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই লিখেছেন যে, শিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষ। তাঁর প্রথম ক্ষুদ্র ভাষণটিই ছিল ভারতের "স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত চার্টার।"[১৫] এই ইতিহাস–সৃষ্টি এবং স্বয়ং ইতিহাস হয়ে ওঠা যে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, ধর্মমহাসভা ছিল তার ক্ষেত্রভূমি মাত্র–সেকথা প্রফেট বিবেকানন্দ জানতেন। আমেরিকা–যাত্রার আগে বোম্বাইয়ে (বর্তমানে মুম্বই) গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে 'অপরিচিত', 'অখ্যাত' সন্ন্যাসী অকস্মাৎ একদিন প্রফেটের কণ্ঠে বললেন : "হরিভাই, আমি আমেরিকা যাচ্ছি। ধর্মমহাসভাটা এরই (নিজের বুকে হাত দিয়ে) জন্য হচ্ছে। শুধু এরই জন্য সব আয়োজন। শীগ্গিরই তারই প্রমাণ দেখতে পাবে।[১৬]

তারপর যা ঘটল সেকথা এতক্ষণ বলেছি। রাতারাতি বিবেকানন্দ হয়ে গেলেন জগৎপ্রসিদ্ধ পুরুষ। ধর্মমহাসভার প্রথম দিন যখন তিনি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন তখনো পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইতিহাসের এক সৃষ্টি, কিন্তু যখন তিনি ভাষণ শুরু করলেন এবং শেষ করলেন তখন তিনি হয়ে গেছেন নতুন ইতিহাসের স্রষ্টা–নতুন ইতিহাসের নায়ক। ইতিহাস তো একেই বলে। ধন্য–ধ্বনি উঠল আমেরিকায়। মহাসাগরের ব্যবধান ডিঙিয়ে প্রবল আকারে তা আঘাত করল স্বামীজীর স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের বুকে। সহস্র সহস্র বছর ধরে ঘুমন্ত ভারতবর্ষ যেন গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। তিন বছরের কিছু পরে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে যখন তিনি প্রথম ভারতের মাটিতে পা রাখলেন তখন তিনি দেখলেন তাঁর ভারত জেগেছেঃ "অন্ধ যে, সে বুঝছে না–আমাদের মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করে জাগ্রত হচ্ছে। আর কেউই তার গতিরোধ করতে সমর্থ নয়।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের সেই অভূতপূর্ব জনজাগরণের জোয়ারকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র–পত্রিকা শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক সাফল্যের সংবাদ প্রকাশ করে চলেছে। (পত্র–পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বোম্বাইয়ের 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া', কলকাতার 'স্টেটসম্যান', 'লাইট অফ দ্য ইস্ট', 'ইন্ডিয়ান মিরার', মাদ্রাজের 'হিন্দু', এলাহাবাদের 'পাইওনীয়ার' প্রভৃতি) বয়সে তাঁর চেয়ে দুবছরের ছোট ও তাঁর পরিচিত, উত্তর কলকাতার যুবক নরেন্দ্রনাথ সেদিন সত্যিই যেন ভারতবর্ষের আত্মাজাগানিয়া–রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রশস্ত ললাটে পরাধীনতার কোন দৈন্যচিহ্ন ছিল না। বিশ্বমঞ্চে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে তিনি দিয়েছেন জাগরণের মহা আহ্বান। সে–আহ্বান শুধু ভারতবর্ষের জাগরণের জন্যই নয়, জগতের জাগরণের জন্যও। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন যে, বিজয়ী বীরের জয়যাত্রার পথটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। কন্টকাকীর্ণ সেই পথের প্রত্যেক ইঞ্চি তাঁকে লড়াই করেই অধিকার করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে প্রতারণা, দুর্নামের কলঙ্ক, পরিচিতের বিদ্রূপ। বক্ষ রক্তাক্ত হয়েছে, কিন্তু মুখের হাসি কখনো ম্লান হয়নি। রক্তাক্ত চরণে নিজের অন্তরের আলোকে একাকী তিনি এগিয়ে চলেছেন, বিদেশের মাটিতে তুলে ধরেছেন দেশ, ধর্ম ও জাতির বিজয়পতাকা। স্বামীজীর শিকাগো ভাষণ দানের ছয় মাসের মধ্যেই (২৩ ফাল্গুন ১৩০০–৬ মার্চ ১৮৯৪ তারিখে) রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় বিবেকানন্দের সেই বিজয়কীর্তিকেই স্মরণ করেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়।

"ওরে, তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ–জনে...
বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।...
যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সঙ্কট–আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।...
মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস

মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়–গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা। তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি, তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,...
ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি–
যে–মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।''

শিকাগো ধর্মমহাসভার কয়েক বছর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন। কবিতাটির নাম 'বর্ষশেষ'। রচনাকাল–৩০ চৈত্র ১৩০৫ (১২ এপ্রিল ১৮৯৯)। মাত্র দুবছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ঐতিহাসিক 'পাশ্চাত্য–বিজয়' শেষে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। কলম্বো থেকে কাশ্মীর পরিভ্রমণ করে তাঁর নতুন বার্তা প্রচার করেছেন। ভারতবর্ষ তার বিজয়ী বীরকে সর্বত্র উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। তাঁর বজ্রসঙ্গীতে ভারতবর্ষের মানুষ মগ্নচৈতন্য থেকে উত্থিত হয়েছে। ঘোড়া খুলে দিয়ে তাঁর বিজয়রথ টেনে নিয়ে চলেছে দেশের রাজা–মহারাজারা, দেশের দামাল যুবক–তরুণরা। আর তিনি চলেছেন নতুন ভারতের উদ্দেশে তাঁর বজ্রবাণী ঘোষণা করে। রোমাঁ রোলাঁ বীরসন্ন্যাসীর সেই বিজয়যাত্রার অপূর্ব ছবি এঁকেছেন তাঁর বিবেকানন্দ–জীবনীতে ''তিনি চলিলেন বিজয়ীর বেশে, তাঁহার সঙ্গে চলিল অগণিত মানুষের এক উন্মত্ত জনতা। রাজারা তাঁহার সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার রথের রজ্জু ধরিলেন। কামান গর্জিয়া উঠিল, দলে দলে চলিল হস্তী, চলিল উষ্ট্র।... তাঁহার সমস্ত যাত্রাপথে তিনি বক্তৃতার পর বক্তৃতায় বাতাসে বাণীর বীজ উড়াইয়া চলিলেন। এমন সুন্দর, এমন দৃপ্ত বক্তৃতা ভারত ইতিপূর্বে আর শোনে নাই। সমস্ত দেশ রোমাঞ্চিত হইল।

''জনসাধারণের এই উন্মত্ত প্রত্যাশার প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁহার 'ভারতের প্রতি বাণী' ঘোষণা করিলেন। সে–ঘোষণা ছিল শঙ্খধ্বনির মতো। সে–শঙ্খধ্বনি রামচন্দ্র, শিব ও কৃষ্ণের দেশকে পুনরায় জাগ্রত হইতে আহ্বান করিল তাহার শৌর্যশীল মানস–সত্তাকে, তাহার অমর আত্মাকে সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হইতে বলিল। তিনিই ছিলেন সেনাপতি। তিনি তাঁহার 'অভিযানের পরিকল্পনা' ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন এবং জনসাধারণকে সমগ্রভাবে উত্থিত হইতে আহ্বান করিলেন।

''তাঁহার মাদ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি যে–প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছিল,... মানুষ সেই স্রোতাবর্তের উত্তাল তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের বেগে ভাসিয়া গেল।''[১৮]

এবার যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত কবিতাটির দু–একটি স্তবক মিলিয়ে দেখি, তাহলে 'বিশ্বজয়ী' বীরসন্ন্যাসীর রূপচ্ছবিটি কি আমাদের চোখে ভাসে না?–

''রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজসম
গর্বিত নির্ভয়–
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম না'ই বুঝিলাম,
জয় তব জয়।।
*

''জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে,
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ–
প্রণমি তোমারে।।
*

''হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রণন–
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরি,
করহ আহ্বান–
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।।''

আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ যখন এই ছত্রগুলি লিখছিলেন তখন তাঁরও মানসনেত্রে স্বদেশ–প্রত্যাগত বিজয়ীবীর বিবেকানন্দের প্রদীপ্ত মূর্তিটি অভ্রান্তভাবে উপস্থিত ছিল। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক এবং

প্রথিতযশা বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুও এই পটভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার উল্লিখিত ছত্রগুলিকে দেখেছেন।

১৩২১ সালের ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকটি লিখেছিলেন। এই নাটকে একটি গান আছে যাতে শিকাগো ধর্মমহাসভায় সমবেত বয়োবৃদ্ধ ও বয়োপ্রবীণ প্রাজ্ঞ প্রতিনিধিদের ছাপিয়ে তরুণ বিবেকানন্দের গৌরবময় আত্মপ্রকাশ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইতিবৃত্তকে তিনি স্মরণ করেছেন বলে মনে হয়।

নবীন রূপের গান

"এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে,
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়-
এ কী গো বিস্ময়।
অবাক আমি তরুণ গলার গান শুনে।
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্ আগুন ঢাকা রয়-
এ কী গো বিস্ময়।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ কোন্ তূণে।।"

পাণ্ডুলিপি অনুসারে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৫ ফাল্গুন ১৩২১ (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫)। তিনি তাঁর কবিতায় লিখেছেন-যে বিশ্বজয়ী "বালকবীর"-এর আগমনের জন্য কবি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন, তিনি এসেছিলেন "ফাল্গুনে"। বিশ্বজয় করে বিবেকানন্দের জন্মভূমি কলকাতায় পদার্পণ হয়েছিল এর কয়েক বছর আগে ঐ ফাল্গুনেই-৯ ফাল্গুন ১৩০৩ (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭)। কয়েকদিন পরে ২৮ ফেব্রুয়ারি (১৮ ফাল্গুন ১৩০৩) কলকাতার শোভাবাজার রাজবাটীতে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে স্বামীজী বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। সেই অভিনন্দনসভায় রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

অর্থাৎ পৃথিবীর 'নব কলম্বাস' বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথের চিনতে ভুল হয়নি। ভুল হয়নি অরবিন্দেরও। শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভূত ভারতপুরুষ বিবেকানন্দ যে বিশ্বপুরুষ বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, যাঁর হাতের মুঠিতে ধরা ছিল নতুন পৃথিবীর জীবন-সেই কথাই অপূর্ব ভাষায় লিখেছিলেন অরবিন্দঃ "The going forth of Vivekananda, marked out by the Master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that India was awake not only to survive but to conquer." [বিবেকানন্দের যাত্রা, যে-বিবেকানন্দকে তাঁর গুরু চিহ্নিত করেছিলেন সেই বিরাট শক্তিধর পুরুষরূপে যিনি গোটা পৃথিবীকে দুহাতে ধরে পালটে দিতে সমর্থ, ছিল পৃথিবীর সম্মুখে প্রথম সুস্পষ্ট লক্ষণ-ভারতবর্ষ জাগ্রত হয়েছে শুধু নিজে বাঁচার জন্য নয়, পরন্তু (বিশ্বকে) জয় করার জন্য]

আমরা আবার ফিরে যাই পৃথিবীর 'নব কলম্বাস'-এর আত্মপ্রকাশক্ষেত্র শিকাগো ধর্মমহাসভায়। আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা 'বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখে ধর্মমহাসভার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ফ্রান্সিস এলবার্ট ডাউটি লিখিত সেই প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিলঃ "..[ধর্মমহাসভার] সবচেয়ে চমক-লাগানো চেহারা ব্রাহ্মণ-সাধু বিবেকানন্দের। তাঁর বৃহৎ সুগঠিত আকার, অসাধারণ সুন্দর দেহভঙ্গি, চৌকস ধরনের পরিষ্কার কামানো মুখের সুঠাম সৌন্দর্য, শুভ্র দন্তপঙ্ক্তি, সুবিন্যস্ত অধরোষ্ঠ, কথোপকথনকালে যা প্রায়শ সদয় হাসিতে বিভক্ত হয় স্কন্ধোত্থিত মনোহর মস্তক কমলা বা রক্তবর্ণের পাগড়িতে সজ্জিত নিম্নজানু পর্যন্ত লম্বিত উজ্জ্বল কমলা বা রক্তবর্ণের আলখাল্লা কোমরবন্ধনীতে আবদ্ধ কথা বলেন চমৎকার ইংরেজীতে প্রশ্ন আন্তরিক হলে উত্তর দেন সাগ্রহে।

"তাঁর ব্যবহার অতি সরল তারি মধ্যে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু ব্যক্তিগত সমীহভাব থাকে-তাঁর স্বয়ংবৃত সন্ন্যাসজীবনের রীতিই তার মূলে।...

"ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের ভাষণ ঊর্ধ্বাকাশের মতোই উদার সর্বজনীন ধর্মের পরম বিকাশরূপে তা সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠাংশকে আলিঙ্গন করেছে সমগ্র মানবের জন্য করুণায় তা স্পন্দিত তাতে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের প্রেরণায় শুভকর্মের আহ্বান-শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে নয়। ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ অতিশয় প্রিয়-তাঁর চিন্তার ঐশ্বর্যের জন্য, অবয়বের মহিমার জন্যও বটে। মঞ্চে পদার্পণমাত্রে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়, আর সহস্র সহস্র মানুষের এই উচ্চারিত সমাদরকে তিনি শিশুর আনন্দে গ্রহণ করেন, তাতে অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকে না। এই তরুণ, সুবিনীত ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীর পক্ষে দারিদ্র্য ও আত্মবিলয়ের জগৎ থেকে খ্যাতি ও প্রাচুর্যের শিখরে সহসা উত্থান নিশ্চয়ই এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।"[১৯]

সে-যুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং বিখ্যাত আবিষ্কারক ('ম্যাক্সিম গান'-এর) স্যার হিরাম স্টিভেন্স ম্যাক্সিম অংশগ্রহণ করেছিলেন ধর্মমহাসম্মেলনে। তিনি তাঁর অনুভূতি এবং উপলব্ধির কথা লিখেছেন :

"কয়েক বছর আগে শিকাগোয় একটি ধর্মমহাসম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। অনেকেই বলেছিল, এ অসম্ভব। যেখানে প্রতিটি দলই নিজেকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত এবং অপরকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মনে করে সেখানে কি করে বোঝাপড়া হবে? তাহলেও এই ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে প্রতি বছরে আমেরিকার দশ লক্ষ ডলারের বেশি বাঁচিয়ে দিয়েছিল সেই সঙ্গে, বলা বাহুল্য, বিদেশে বহু আমেরিকানকে প্রাণ দিতে হয়নি এবং এটা সম্ভব হয়েছিল একজন সাহসী ও সৎ মানুষের জন্য। শিকাগোয় ধর্মমহাসম্মেলন হবে বলে যখন কলকাতায় ঘোষণা শোনা গেল তখন সেখানকার কিছু ধনী ব্যবসায়ী আমেরিকানদের কথায় আস্থাস্থাপন করে একজন সন্ন্যাসীকে তাদের দেশে পাঠাল-তাঁর নাম বিবেকানন্দ, পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মসন্দ্রের প্রতিনিধি তিনি। এই সন্ন্যাসীর

ব্যক্তিত্ব প্রভাবশালী, পাণ্ডিত্য বিপুল, ইংরেজী বলেন ওয়েবস্টারের মতো। [ধর্মমহাসভায়] আমেরিকার প্রোটেস্টান্টরা অপর সকল সম্প্রদায়ের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। তারা ভেবেছিল, খুব সহজেই বাজিমাত করবে, আরম্ভও করেছিল বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভাবখানা ছিল–'দেখ, কিভাবে তোমাদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিই।' তাদের বক্তব্য ছিল নোভাস্কোশিয়া (Nova Scotia) থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার ক্ষুদ্রতম গ্রামে বারবার কপচানো সেই পুরনো বস্তা পচা বুলি। এসব শোনার আগ্রহ কারো ছিল না–সেদিকে কেউ চেয়েও দেখল না।

"তারপর যখন বিবেকানন্দ কথা বললেন তখন তারা বুঝল যে, এবার একজন নেপোলিয়নের সঙ্গে লড়তে হবে। তাঁর প্রথম ভাষণটি ঐশ্বরিক উন্মোচন ভিন্ন আর কিছু নয়। রিপোর্টাররা তার প্রতিটি শব্দ আগ্রহের সঙ্গে লিখে নিল, সেগুলি দেশের সর্বত্র টেলিগ্রামে প্রেরিত হলো, হাজার হাজার কাগজে তা মুদ্রিত হলো। বিবা কানন্দ সেদিনের সিংহে (Lion of the day) পরিণত হলেন। শীঘ্রই তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বিপুল হয়ে দাঁড়াল। তাঁর বক্তৃতাকালে এত শ্রোতার সমাগম হতো যে, কোন হলঘরেই জায়গা হতো না। ওরা এতদিন এশিয়ার দরিদ্র, অন্ধকারাচ্ছন্ন, পৌত্তলিকদের ধর্মান্তরিত করে তাদের অপবিত্র আত্মার পরিত্রাণের জন্য বেছে বেছে কিছু মূর্খ মেয়ে, কিছু অর্ধশিক্ষিত নির্বোধ লোক এবং হাজার হাজার ডলার পাঠিয়েছে। আর এখানে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে একজন অপরিত্রাত মানুষের নিদর্শন–যিনি সারা দেশের তাবৎ যাজক আর মিশনারিদের চেয়ে দর্শন ও ধর্ম অনেক ভাল জানেন। এই প্রথম ধর্ম তাদের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হলো। তার মধ্যে যে এত কিছু আছে, এ তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আর এ নিয়ে বিতর্কও অসম্ভব। বেড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে তেমনি বিবা কানন্দ পাদরীদের নিয়ে খেলা করলেন। মিশনারিরা ভয়ানক আতঙ্ক বোধ করল। তারা আর কি করতে পারে কিন্তু তারা কি করল? সবসময়েই যা তারা করে থাকে–তাঁকে নিন্দা করল শয়তানের চর বলে। কিন্তু কাজের কাজ সমাধা হয়ে গেল, বীজ উপ্ত হলো, আমেরিকা চিন্তা করতে শুরু করল। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল, 'এঁর মতো মানুষদের শিক্ষাদান করার জন্য আমরা কি মিশনারি পাঠাব, যারা এঁর তুলনায় কিচ্ছু জানে না? কখনো না' এর ফলে মিশনারিদের আয় বছরে এক মিলিয়ান ডলার কমে গেল।"[২০]

শেষ করার আগে আবার ফিরে যাই শিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর প্রথম আবির্ভাবের মুহূর্তটিতে, যে–মুহূর্তটি ছিল বাস্তবিক নতুন ভারতবর্ষের জন্মলগ্ন–জন্মলগ্ন সর্বপ্রকার অসহিষ্ণুতা–মুক্ত নতুন এক পৃথিবীর, নতুন এক সভ্যতার। সমকালীন আমেরিকার বিশিষ্ট কবি হ্যারিয়েট মনরো সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভাবছিলেন : "কমলারঙের পোশাক–পরিহিত সুদর্শন সন্ন্যাসীই আমাদের সর্বোত্তম বস্তু দিলেন।... তাঁর সংযত আবেগের অন্তর্লীন প্রবলতা, প্রতীচ্য জগতের সামনে প্রথম উচ্চারিত ও আবির্ভূত তাঁর বাণীর সৌন্দর্য–এই সমস্ত কিছু মিশ্রিত হয়ে চরম অনুভূতির এক নিখুঁত বিরল মুহূর্ত আমাদের দান করল। মানব–ভাষণের তা–ই ছিল সর্বোচ্চ শিখর।"[২১]

বাস্তবিক, স্বামী বিবেকানন্দের যে–সাফল্য, সে–সাফল্য কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, তা নিখিল মানবাত্মারই সাফল্য। মানুষের ভিতর যখন তার অন্তরস্থিত ব্রহ্ম জেগে ওঠেন তখন পৃথিবী তাঁর পদতলে মাথা লুটোয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখব, সেই ইতিহাস কয়েকজন মানুষেরই ইতিহাস–যাঁরা আত্মবিশ্বাসী, যাঁরা আত্মশক্তিকে জাগ্রত করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাই করেছিলেন।

ঐ যেন আমরা মানসনেত্রে দেখছি, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বর্ণাঢ্য মঞ্চে প্রবেশ করছেন। সহস্র সহস্র নরনারীর বিমুগ্ধ নয়নের দৃষ্টি পতিত হলো সূর্যসঙ্কাশ সেই নরকেশরীর ওপর। মিস লরা এফ. গ্লেনের (পরবর্তী কালে ভগিনী দেবমাতার) স্মৃতিঃ

"শ্ শ্ শ্–চুপ শান্ত পদক্ষেপে বিবেকানন্দ এগিয়ে আসছেন ও মর্যাদায় উন্নত আকার নিয়ে মধ্যবর্তী সিঁড়ির ওপর দিয়ে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার বলতে আরম্ভ করলেন, আর বিগলিত হয়ে গেল স্মৃতি, কাল, স্থান, মানুষ–সমস্তই। কিছুই নেই, কেবলমাত্র শূন্যের মধ্যে ধ্বনিত কণ্ঠস্বর মনে হলো যেন আমার সামনে দ্বার খুলে গিয়েছে, আমি তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছি কোন্ অসীম লক্ষ্যে। শেষ প্রান্ত এখনো অগোচর–কিন্তু কী আছে সেখানে, তার আলোকিত বার্তা রয়েছে ওঁর চিন্তায়, ঐ ব্যক্তিত্বে, যিনি ঐ পথে আমাদের আহ্বান করছেন। ঐ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন–অনন্তের দিব্য দিশারী"[২২]

পাদটীকা

১ মহাভারত (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত), বনপর্ব, ২৬৭।৮৪

২ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬১

৩ স্বামী বিবেকানন্দের প্রচলিত সমস্ত প্রামাণ্য জীবনী অনুযায়ী স্বামীজীর সঙ্গে মিস কেট স্যানবর্নের প্রথম পরিচয় হয়েছিল শিকাগো থেকে বস্টনের পথে ট্রেনে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, এযাবৎকাল সুপরিজ্ঞাত এই তথ্যটি সঠিক নয়। শ্রীসারদা মঠের ষাণ্মাসিক ইংরেজী মুখপত্র 'সম্বিৎ' ('Samvit') পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সংখ্যায় প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা 'কেট স্যানবর্ন অ্যান্ড হার রেমিনিসেন্সেস অফ স্বামীজী' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি মিস কেট স্যানবর্নের স্বামীজী সম্পর্কে লেখা স্মৃতিকথা থেকে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি উপস্থাপন করেন :"I had met him [i.e. Swamiji] in the observation car of the Canadian Pacific... enroute for Chicago." [আমি তাঁকে (স্বামীজীকে) দেখেছিলাম ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিকের অবজারভেশন কামরায়... শিকাগোর পথে] বস্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত 'গোল্ডেন জুবিলী (১৯৪২–১৯৯২) স্মরণিকাতেও এই উক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে (পৃঃ

১৩)। সুতরাং মিস কেট স্যানবর্নের নিজের কথা থেকেই জানা যাচ্ছে যে, শিকাগো থেকে বস্টনের পথে নয়, ভ্যাঙ্কুভার থেকে শিকাগোর পথে ট্রেনে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল। ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে স্বামীজীর জন্মতিথির দিন বিকালে ধর্মসভায় সিস্টার গার্গী (মেরি লুইস বার্ক) তাঁর ভাষণে প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার গবেষণালব্ধ এই নতুন আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁর গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তিনি এটি উল্লেখ করবেন এবং পূর্ববর্তী ভুল সংশোধন করে দেবেন।

৪ দ্রঃ 'Life', Vol. I, pp. 405-406

৫ দ্রঃ 'Complete Works', Vol. I, pp. 3-4

৬ দ্রঃ 'Life', Vol. I, p. 418

৭ Ibid.

৮ দ্রঃ 'Life', Vol. I, p. 429; বঙ্গানুবাদ–শঙ্করীপ্রসাদ বসু (দ্রঃ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭)

৯ দ্রঃ Ibid., p. 431

১০ দ্রঃ 'New Discoveries', Pt. I, p. 128 বঙ্গানুবাদ–শঙ্করীপ্রসাদ বসু (দ্রঃ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২২)

১১ দ্রঃ 'New Discoveries', Pt. I, pp. 273-274 বঙ্গানুবাদ–শঙ্করীপ্রসাদ বসু (দ্রঃ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯–১২০)

১২ দ্রঃ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১২

১৩ দ্রঃ 'New Discoveries', Pt. I, p. 138

১৪ দ্রঃ 'বাণী ও রচনা', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪

১৫ দ্রঃ 'Complete Works', Vol. I, Introduction, p. xiii

১৬ দ্রঃ 'Spiritual Talks', p. 254 'স্মৃতির আলোয়', পৃঃ ৪ 'যুগনায়ক', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১ স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ২৯

১৭ দ্রঃ 'Complete Works', Vol. III, p. 146

১৮ দ্রঃ 'বিবেকানন্দের জীবন', পৃঃ ৭৬–৮৩

১৯ দ্রঃ 'New Discoveries', Pt. I, pp. 87-90 বঙ্গানুবাদ–শঙ্করীপ্রসাদ বসু (দ্রঃ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪–৫৬)

২০ দ্রঃ 'New Discoveries', Pt. I, pp. 138-140

২১ দ্রঃ 'New Discoveries', Pt. I, p. 86 বঙ্গানুবাদ–শঙ্করীপ্রসাদ বসু (দ্রঃ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭)

২২ দ্রঃ 'সমকালীন', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬